সাত মহাদেশ পাঁচ সাগরেই নয় দুনিয়ার শেষ
নাম-না-জানা পাহাড়, নদী, সমুদ্র ও দেশ,
ইচ্ছেডানায় ঘুরি, অলীক জগত গড়ে তুলি
কেবল তোমার জন্য লেখা এই গল্পগুলি।

আমার কথা

বই পড়া জ্ঞান অর্জনের জন্য তো নিশ্চয়ই, তবে মনকে আরাম দেওয়ার জন্যও। এই সংকলনে ওই শেষের বিষয়টিতেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ছোটোদের যা-যা পছন্দ সেই সান্টা ক্লজ থেকে ভূত, রহস্য গল্প থেকে শুরু করে সায়েন্স ফ্যান্টাসি, প্রায় সবই এখানে মজুত। অবশ্য সবই আছে বলাটা ভুল হবে। কারণ একটা জিনিস লক্ষণীয়ভাবে এ বইতে অনুপস্থিত, তা হল গুরুমশাইপনা। ছোটোরা ওই জিনিসটি খুব একটা পছন্দ করে না। আমি যখন ছোটো ছিলাম, আমিও করতাম না। বরং তেমন জ্ঞানী মানুষ দেখলে সরে পড়তাম। তাই পণ্ডিতি ব্যাপারটা এই বইয়ে উহ্য রাখা হল। কোনও গল্পে যদি চলেও আসে, ধরে নিতে হবে সেটা লেখকের নজর এড়িয়ে গেছে। বরং পাঠকদের সামনে খুলে যাক ইন্দ্রকোশ। বেরিয়ে আসুক একের পর এক মণিমাণিক্য, আর চোখ ধাঁধিয়ে যাক তাদের, সেটিই কাম্য। তথাকথিত 'সামাজিক' গল্পও এই সংকলনে নেই। প্রকাশক বিশেষভাবে চেয়েছিলেন অন্য ধারার গল্পগুলি এখানে ঠাঁই পাক, তাই।

প্রায় প্রত্যেকটি গল্পই এর আগে কোনও না কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আছে কয়েকটি অপ্রকাশিত লেখাও, যেগুলি বিশেষ করে এই সংকলনের জন্যই লেখা। সময়কাল মোটামুটি ২০১৩ সাল থেকে ২০২৪ সাল। এই সময় জুড়ে ছেলেমেয়েদের দুনিয়াটা অনেক পালটে গেছে, বদলে গেছে গল্পের ধাঁচও। একটু খেয়াল করলে সেই পরিবর্তনের ছাপও এখানে নজরে পড়বে।

ছোটোবেলায় মনটি নরম থাকে। তখন শরতের সাদা মেঘের ভেতরে খুঁজে পাওয়া যায় এঁকে-বেঁকে চলে যাওয়া একটি নদীর আদল, যার পাশে গালে হাত দিয়ে বসে আছে চিরন্তন কিশোরী। বর্ষার যে জল রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, তার স্রোতে কাগজের নৌকো ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, যে নৌকো একদিন পৌঁছবে রূপনগরের ঘাটে।

শীতের কুয়াশায় যখন চারদিক ঢাকা, তখন শিউরে ওঠে শরীর। হয়তো সেই কুয়াশার পেছনেই কোথাও লুকিয়ে রাখা আছে ভিনগ্রহীদের যান।
যারা সেসব খুঁজে পায়, এ বই তাদের জন্য। আর যাঁরা একদিন নিজেদের ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন সেই সব রূপকথাকে, এ বই তাঁদেরও। কে না জানে, অলীকপুর আসলে দূরের কোনও পাহাড়, সমুদ্র বা জঙ্গলের আড়ালে নেই। আছে আমাদের চারপাশেই।

খুঁজে নিতে হবে শুধু।

আসানসোল
১৫.০১.২০২৫

রঞ্জন দাশগুপ্ত

সূচিপত্র

সোমাইয়ের দাদু	১৩
বাঘদহের হাবুলস্যার	১৯
রিপুদমনের ডাইরি	২৫
নতুন রাঁধুনি	৩১
খেলাঘর	৪৩
ক্যালাইডোস্কোপ	৫১
বসত করে কয়জনা	৬৯
গড় পঞ্চনাগপুর বয়েজ হোস্টেল	৭৯
চিন্তাহরণবাবু	৮৯
মহাকালের দোলনায়	৯৭
হুড়ুকথাম্বা	১০৯
তামার আংটি	১১৭
‘র’—এ রতন	১৩৩
ফুটো	১৪৩
মধুবাবুর বাজার বিভ্রাট	১৫১
বইপোকার খোঁজে	১৫৭

সোমাইয়ের দাদু

ঢালু পাহাড় বেয়ে তরতর করে নেমে এল সোমাই। একে এত ঢালু, তার ওপর পায়ের নীচে নুড়ি। গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। তবে ওর বয়স সে ভয়ের কী জানে!

চারদিকে পাহাড়, আর মাঝে জঙ্গলে ঘেরা আদিবাসীদের গ্রাম। তার নামটা না-ই বা বললাম। গ্রামের মানুষদের বেশিরভাগ আদিবাসী খ্রিস্টান—সোমাইরা যেমন। পাহাড়ের ঢালু জমিতে সবজি চাষ করেন ওর বাবা। সামনে জঙ্গলে পাওয়া যায় কাঠ আর মধু। সেসব দূরের শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রিও করেন তিনি। অবশ্য ওর বাবা একা নন। এ তল্লাটের আরও অনেকে দল বেঁধে যায় শহরে। জঙ্গলের মধ্যে সরু পথ ধরে। সেখানে বুনো জন্তু আর সাপখোপের ভয়ও আছে।

পাহাড়ের ওপরে কিছুটা জায়গা সমতল। সেখানে আছে গির্জা আর সোমাইদের স্কুল। স্কুল বলতে অবশ্য ইঁটের বড়ো-বড়ো দুটো ঘর। তার ওপরে লালটালির ছাদ। আছেন দুজন শিক্ষক।

আজ ২৪ ডিসেম্বর। সোমাইদের স্কুলে এখন লম্বা ছুটি চলছে। তাই জিমিকে নিয়ে পাহাড়ে বেড়াতে এসেছিল ও। জিমি নেহাতই দেশি কুকুর। কিন্তু বাঘের মতো শক্তিশালী। ও সঙ্গে থাকলে কোনও ভয় নেই সোমাইয়ের।

সোমাই ভাবছিল সান্তাবুড়োর কথা। প্রতি বছর নাকি বুড়োমানুষটি বড়োদিনের রাতে আকাশ থেকে নেমে আসেন নীচে, বাচ্চাদের জন্য গিফট্ নিয়ে। বাবা বলেন, ওঁর নাম 'জারমা'। আরেকটা ভালো নাম আছে, 'ক্রিস্টোফার'।

সান্তা কি কখনও সোমাইদের মতো বাচ্চাদের কিছু দেন, মনে হয় না। ও তো

কখনও কিছু পায়নি। ওদের গ্রামের কোনও বাচ্চাই পায়নি। কেনই বা পাবে? ওরা যে খুব গরিব। মনে মনে ভাবল সোমাই। আজ বড়োদিনের রাতেও ওদের বাড়িতে রোজকার মতো দুটো মোমবাতি জ্বলবে। আর শহরে কত আলো এক-একটা বাড়িতে! সে একবার বড়োদিনের সময় বাবার সঙ্গে শহরে গিয়েছিল। দেখেছিল মস্ত মস্ত সব পাকা বাড়ি। সেখানে লাল, নীল, বেগুনি, সবুজ আলো ঝলমল করছে। ওরা কোথায় পাবে ওইসব? ওদের গ্রামের বাকিরাও বা পাবে কোথায়? সবাই তো গরিব। বাবা অবশ্য বলেন, "গরিব হলে অনেক কিছু শেখে মানুষ। কষ্টে, অভাবে থাকতে হয়। তবেই না মানুষ মানুষের মতো হবে।"

কে জানে! সবটা ঠিক বুঝতে পারে না ও।

শীতকালের বেলা। এর মধ্যেই সূর্য ঢলে অন্ধকার নেমে আসছে। খালি ওই দূরের পাহাড়টার মাথায় সিঁদুরে রং। বাকি সব জায়গা আবছায়া। হালকা করে কেউ যেন বুলিয়ে দিচ্ছে কালি।

আরও নীচে নেমে সবুজ রঙের একটা পাথর। সেখান থেকে দু'পাশে পাথরের দেয়াল নিয়ে রাস্তা আরও নীচে নেমে গেছে। ওখানটাতে এসে সোমাই জিমির ডাক শুনতে পেল। ও আগেই নেমে গেছে। ডাক শুনে বোঝা যাচ্ছে বিপদ হয়েছে কিছু। দৌড়ে নীচে নামল সোমাই। একটা বড়ো পাথরের পাশেই পড়ে আছেন একজন বুড়োমানুষ। পাশে তাঁর মস্ত ঝোলা। আর সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চেঁচিয়ে যাচ্ছে জিমি। ওকে দেখে জোরে জোরে লেজ নাড়তে লাগল সে। বুড়োমানুষটি অতি কষ্টে ঘাড় ঘোরালেন ওর দিকে। মিষ্টি বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, "এটা তোমার কুকুর?"

"হ্যাঁ।"

"সরাও বাপু। এক্ষুনি না দাঁত বসিয়ে দেয়!"

দু'দিকের বগল ধরে কোনোক্রমে বুড়োমানুষটিকে বসিয়ে দিল সোমাই। সে কি আর অত পারে! অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল, তাঁর গায়ের রং ধবধবে সাদা। ঠিক গির্জার ফাদারের মতো। অবশ্য উনি খুব লম্বা, আর ইনি গোলগাল।

"আপনার খুব লেগেছে বুঝি! পড়ে গেলেন কী করে?"

"আর বোলো না বাপু। ওপর থেকে নামছি, এমন সময় একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম। ভাগ্যিস তুমি এলে! আহ্ আহ্!" পা-টা টান করলেন

উনি- "মনে হচ্ছে ভাঙেনি।"

"নীচে নামতে পারবেন?"

"বুড়ো হাড়ে আর কি সে জোর আছে! দেখো, যদি নিয়ে যেতে পারো। আমার গাড়িটাও যে কোথায় গেল!"

"আচ্ছা। তুমি এখানেই বোসো একটু। চিন্তা কোরো না। এক্ষুনি আসছি।" বলে, লোকটাকে পাথরের ওপর বসিয়ে সোমাই দৌড়ে নেমে গেল নীচে। বাবা-সহ বেশ কয়েকজন বড়োকে নিয়ে ফিরে এল সোমাই। ওদের ঘরে টর্চও নেই। মশাল নিয়ে এসেছে হাতে। সবাই মিলে ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে এল নিজেদের বাড়িতে। দু'টি মাত্র ঘর ওদের। তার মধ্যে যেটি বড়ো, সেটিতে খড় বিছিয়ে বুড়োমানুষটির জায়গা করে দেওয়া হল। সোমাইয়ের মা একটা মালসাতে করে কাঠকয়লা জ্বালিয়ে নিয়ে এলেন। যা ঠান্ডা এখানে, বুড়োর বুকে না সর্দি বসে যায়!

"এখন কেমন লাগছে দাদু?" বুড়োর মাথায় হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করল সোমাই। জবাবে মিষ্টি করে হাসলেন তিনি। অন্ধকারের মধ্যেও মুক্তোর মতো দাঁতগুলি ঝিলিক মারল। যেন হেসে উঠল তাঁর চোখগুলিও।

"ভালো লাগছে দাদুভাই। সত্যি, তোমরা খুব ভালো মানুষ।"

"কোথা থেকে আসছ দাদু? কাদের বাড়ি যাবে?"

উত্তর দিলেন না তিনি। জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। সেখানে ঝকঝকে রাতের আকাশ। এখনও বোঝা যাচ্ছে তার গাঢ় নীল রং। হিরের কুচির মতো ঝলমল করছে তারাগুলি। আনমনে তিনি বললেন, "প্রথমে মনে হচ্ছিল যেন ভুল জায়গায় এসেছি। কিন্তু তা তো না! এই তো! এখানেই আসার কথা ছিল আমার।"

"ঠান্ডা লাগছে দাদু? জানলা বন্ধ করে দেবো?"

"না, না। কই আর ঠান্ডা।" বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন তিনি। তার পর বিড়বিড় করে বললেন, "নিঝুম রাত। চারদিকে ঝরে ঝরে পড়ছে সাদা বরফ। চাঁদের রূপকে হার মানিয়ে নীল অন্ধকারের মধ্যে উড়ে যাচ্ছে ধবধবে সাদা হাঁস।"

"কোথায় দাদু?" চোখ বড়ো করল সোমাই।

"বলব। সব বলব তোমাকে।"

রাতে দাদু খেলেন হাতে গড়া লাল আটার একটা রুটি। ছাগলের দুধ আর মধু দিয়ে। মধু ওদের ঘরে থাকে না। বন থেকে যা আনেন, বিক্রি করে দেন বাবা। এবার মা কী কারণে অল্প সরিয়ে রেখেছিলেন।

রাতে শুয়ে-শুয়ে দাদু গল্প বললেন। সাইবেরিয়ায় মাইলের পর মাইল জুড়ে বিছানো বরফের চাদরের গল্প, তিব্বতের কোন অজানা হ্রদে চাঁদের আলোয় ফোটে আশ্চর্য পদ্ম, তার গল্প। অনেকদিন আগে মানস সরোবরে উড়ে আসত এক ধরনের পাখি, তাদের ঠোঁট ঠিক গরুড়ের মতো। তাদের গল্প। ভেড়ার লোমের কম্বলে গা ঢেকে শোনে সোমাই। মা আর বাবা ডাকতে এসে ফিরে যান। আস্তে-আস্তে রাত বাড়ে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে সোমাইয়ের। ছাই হয়ে যায় দরজার কাছে জ্বালানো কাঠও।

চোখে রোদ পড়তে ধড়মড় করে উঠে বসল সোমাই। পাশের বিছানা ফাঁকা। কোথায় গেল দাদু!

বাবা বাড়িতে নেই। নিশ্চয়ই লোমওয়ালা ছাগলগুলোকে চরাতে নিয়ে গেছেন।

মা বললেন, "হয়তো তাড়া ছিল বুড়ো বাবার। খুব ভোরে বেরিয়ে গেছেন। আমি যখন উঠে উনুনে কাঠ দিচ্ছিলাম, তখনও তো তাঁকে দেখতে পাইনি।"

সোমাইয়ের আবছা মনে পড়ল, ও যেন স্বপ্ন দেখছিল। অনেক রাত্রে যেন ঘরে উঁকি মারছিল শিংওয়ালা দুটো হরিণ। দৌড়ে ঘরে ঢুকল ও।

খড়ের গাদায় খোঁজাখুঁজি করতেই দেখতে পেল সুন্দর একটা বেতের ঝুড়ি। ঝুড়ির হাতলে বাঁধা কার্ডে লেখা, 'সোমাইকে ক্রিসমাসের উপহার'। আর সেখান থেকে উঁকি মারছে ধবধবে সাদা একটা হরিণ ছানা।

সবটুকুই স্বপ্ন ছিল না তাহলে! ভাবল সোমাই।

প্রথম প্রকাশঃ 'আনন্দমেলা', ২০.০৩.২০১৪

বাঘদহের হাবুলস্যার

বাবা আর মায়ের এই জায়গাটা পছন্দ হয়নি বটে, তবে অলংকারের কিন্তু বেশ লেগেছে। বেশ বড়ো বড়ো বাগানঘেরা সব একতলা বাড়ি, এদিকে ওদিকে টলটলে জলের অনেক পুকুর, বিশাল বিশাল সব গাছ। অলংকার তার ঘরের জানালার পাশে বসে থাকে। বাইরের মাঠে সব ছেলেপুলেরা খেলা করে। ও বসে বসে তাই দেখে।

অলংকারের বাবা একজন সরকারি কর্মচারি। একটিই ছেলে সে। ঘরে তারা চারজন মাত্র সদস্য। মা, বাবা, অলংকার আর ছোটো থেকে অলংকারের যিনি দেখাশোনা করেন– সেই সান্ত্বনাপিসি। যে ঘরটাতে তারা ভাড়া এসেছে সেটাতে চারটে বড়ো বড়ো ঘর। সেকালের মতো উঁচু দেয়াল, কড়িবরগা দেখতে গেলে ঘাড় উঁচু করে দেখতে হয়। মোটা মোটা সব দেয়াল। ভারি ঠান্ডা। দু'দিকে অযত্নের বাগান। পিছনদিকে বাগানের মধ্যে একটা বিশাল বেড়ের ইঁদারাও আছে। তার জলটা খুব মিষ্টি আর ঠান্ডা।

মুশকিলের ব্যাপার হল ছোটো থেকেই স্নায়ুর কী একটা ভজঘট রোগে অলংকারের ডানদিকের হাত পা সব শুকিয়ে গেছে। ও ভালো করে চলতে পারে না। পেন ধরলে হাতটা ঠকঠক করে কাঁপে, কথা বলতে গেলেও কথা জড়িয়ে যায়। একবার ওকে ইস্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু এইসব অসুবিধার জন্য আর পড়া হয়নি সেখানে। এখন ও ঘরে নিজে নিজেই পড়ে। তাই ওকে নিয়ে ওর বাবা-মায়ের ভারি মুশকিল। তাঁরা হাসেন না, কারো সাথে কথা বলেন না, গল্প করেন না। সব সময়ে গম্ভীর হয়ে থাকেন।

আগে ওরা ভাড়া থাকত আসানসোলে। সেখান থেকে অলংকারের বাবা পশুপতিবাবুর অফিস যাওয়ারও সুবিধে ছিল। অলংকার সারাদিন জানালার পাশে বসে বাজারের ব্যস্ততা দেখত, লোকজন দেখত আর বই পড়ত। সময় কেটে যেত। কিন্তু তারপরেই সমস্যা দেখা দিল। সব পাড়াতেই কিছু বিচ্ছু ছেলে